Bangladesh Journal of Political Economy

© 2017 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 285-296
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

নারী নিগ্রহ, ন্যায্যতার সংকট এবং নারীর প্রতি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক*

সারকথা: *মানব সভ্যতা ও মানবিক মূল্যবোধের উৎসমূলে নারীর অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার, সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নারী-পুরুষ উভয়ের অবদান অনস্বীকার্য। সমাজের নারী-পুরুষ সবারই নিজেকে বিকশিত, ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত করে গড়ে তোলার অধিকার রয়েছে। কিন্তু, নারী তার পরিবারে, সমাজে এবং দেশে-বিদেশে বঞ্চনা ও নির্যাতনের স্বীকার এবং প্রায়শ তার প্রাপ্য অধিকার ও ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হন। নারীর প্রতি জবরদস্তি, হয়রানি, মানসিক নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিবার ছাড়াও রাস্তাঘাটে, বাজার-শপিং মলে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, কর্মক্ষেত্রে, যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন মাধ্যমে (ইন্টারনেটে, মোবাইলে) সংঘটিত হওয়ার ঘটনা প্রায়শই ঘটে। নারী ও মেয়ে শিশুরা যৌন হয়রানি, শারীরিক লাঞ্ছনা ও ধর্ষণের শিকার হন। নিরাপদে পথ চলতে নারীকে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দেয়া যথেষ্ট কঠিন। কর্মক্ষেত্রেও নারী তার নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন। আর্থিক সক্ষমতার বিচারে ব্যক্তি মালিকানার অর্থনীতিতে পারিবারিক অর্থ-সম্পদে নারীর মালিকানা খুবই কম। ব্যাংক, বীমায় নারীর প্রত্যাশিত অভিগম্যতা নেই। সঞ্চয়-বিনিয়োগে স্বাধীনতা অপর্যাপ্ত। এসব কারণে নারীর অসহায়ত্ব বেশি। অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকে নারীর মুক্তি যতদিন না অর্জিত হবে, নারীর প্রতি সুবিচার নিশ্চিত করার প্রয়াস ততদিন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইতিবাচক পরিবর্তনের চিন্তা-ভাবনা ও নারীর জন্য সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘমেয়াদি, সুসংহত এবং কার্যকর উদ্যোগের প্রয়োজন।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর ন্যায্য অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কারো প্রতি কোনো বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। নারীর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদাসহ অন্যান্য অধিকার সংরক্ষণে আইনের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। সংবিধান, আইন, ধর্মীয় অনুশাসনের উপস্থিতি সত্ত্বেও নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রত্যাশিতভাবে বদলায়নি। নারীর সুরক্ষার বিষয়টি পুরুষের (এবং সমাজের) চেতনায়, ধারণায়, জ্ঞানে, বিশ্বাসে, কর্মে ও জীবনচর্চায় স্থায়ী ও সুদৃঢ় করা সম্ভব হলে নারীর প্রতি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। যৌন হয়রানি, ধর্ষণ প্রতিরোধে অপরাধীকে আইনের

* উপ-সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর

আওতায় এনে সুষ্ঠু বিচার ও দণ্ড নিশ্চিত করতে হবে। কেননা, বিচারহীনতা অপরাধের পুনরাবৃত্তিকে উৎসাহিত করে। প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ, ধর্মীয় জ্ঞান, শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি, মানসিকতার পরিবর্তন, মর্যাদা বোধের উন্নয়ন, সামাজিক দায়িত্বশীলতা, মনস্তাত্ত্বিক শৃঙ্খলা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীর ন্যায় বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা যায়। অনেক নারী পরিবারের সদস্য দ্বারা নির্যাতনের অথবা সহিংসতার স্বীকার হন। সে কারণে এ ধরনের পরিবারকে আগে নির্যাতনমুক্ত করা প্রয়োজন। নারীর মর্যাদা দানের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা পরিবার থেকেই অর্জন করতে হবে।

১. ভূমিকা

মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষে ব্যবধান নেই। মানব সভ্যতা ও মানবিক মূল্যবোধের উৎসমূলে নারীর অবস্থান সুদৃঢ়। নারী ব্যতীত পরিবার, সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ কল্পনা করা যায় না। তাই, সমাজের নারী-পুরুষ প্রত্যেক মানুষের নিজেকে বিকশিত, ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত করে গড়ে তোলার সর্বজনস্বীকৃত অধিকার রয়েছে। এ অধিকার কোনো সমাজের বা দেশের নাগরিক হিসেবে সাংবিধানিকভাবে যে কোনো ব্যক্তির প্রাপ্য। সংবিধান ও দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী সব মানুষ নিঃশর্ত ও বাধাহীনভাবে মৌলিক অধিকারসহ আত্মবিকাশের সকল অধিকার ভোগ করতে পারে। এক্ষেত্রে বাধা-বিঘ্ন ঘটলে তা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী হয় এবং দেখা দেয় ন্যায্যতার সংকট। মানবাধিকারের ধারণাটি মানুষের স্বীকৃতি আর চর্চার মধ্য দিয়ে মানবিক সত্তাকে ঘিরে উৎসারিত, অনুপ্রাণিত ও পরিপুষ্ট হয়। ব্যক্তি হিসেবে একজন নারী তার নাগরিকত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় সব সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করার দাবিদার। তাই তার আত্মবিকাশের সুযোগ অবারিত করার পাশাপাশি ন্যায় বিচার প্রাপ্তির অধিকারও নিশ্চিত করা জরুরি। এই ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের, অন্যান্য ব্যক্তি (নারী কিংবা পুরুষ), পরিবার, পরিবারের সদস্য ও সমাজের দায়িত্ব রয়েছে। বাস্তবে, নারী তার পরিবারে, সমাজে, দেশে-বিদেশে বঞ্চনা ও নির্যাতনের স্বীকার এবং প্রায়শ তার প্রাপ্য অধিকার ও ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হন। এ ধরনের অন্যায্য পরিস্থিতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিবাদের অভাব যে নিপীড়নমূলক সংস্কৃতির জন্ম দেয়, সহসা তা সমাজ থেকে দূর করা সম্ভব হয় না।

২. সংবিধানে নারী অধিকারের নিশ্চয়তা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর ন্যায্য অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করে বলা হয়েছে: জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে (অনুচ্ছেদ ১০)। আইনের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমতা বিধানের জন্য বলা হয়েছে যে, সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী (অনুচ্ছেদ ২৭)। ধর্ম প্রভৃতি কারণে নারী পুরুষের বৈষম্য নিরসনের নিশ্চয়তা দিয়ে বলা হয়েছে– কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবেন না (অনুচ্ছেদ ২৮.১)। রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন (অনুচ্ছেদ ২৮.২)। কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না (অনুচ্ছেদ ২৮.৩)। সরকারি নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সুযোগের সমতা সম্পর্কে বলা হয়েছে: প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে

(অনুচ্ছেদ ২৯.১)। কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না (অনুচ্ছেদ ২৯.২)।

৩. নারীর ন্যায় বিচার ও অধিকার সংরক্ষণে আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত হবার ফলে স্বাধীন দেশে নারী মুক্তির পথ সুগম হয়। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক নারীবর্ষ ঘোষিত হলে বিভিন্ন দেশে নারীবান্ধব কার্যক্রম সক্রিয় হতে শুরু করে। ১৯৭৬-১৯৮৫ সময়কালকে নারীদশক ঘোষণার প্রেক্ষাপটে নারীর অধিকারের বিষয়গুলো অনেকের নজরে আসে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রয়াসে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে যে মহিলা সংস্থার রূপরেখা প্রণীত হয়, কালক্রমে তা জাতীয় মহিলা সংস্থা হিসেবে একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ১৯৮৪ সালে সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকার মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর গঠন করেন। বর্তমানে নারীদের কল্যাণে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

নারীর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদাসহ অন্যান্য অধিকার সংরক্ষণে আইনের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। প্রচলিত আইনে নারীর কি কি আধিকার ও সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তা সবার জানা প্রয়োজন। কোন নারী যদি নির্যাতনের স্বীকার হন সেক্ষেত্রে তার জন্য সুনির্দিষ্ট কি কি প্রতিকার রয়েছে সে সম্পর্কে তার অথবা তার পরিবারের সম্যক জ্ঞান থাকা জরুরি। কেননা, তথ্য বা ধারণার অভাবে প্রতিকার প্রাপ্তি বিলম্বিত অথবা অসম্ভব হতে পারে। নারী আধিকার সম্পর্কে দেশে প্রচলিত আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯, মুসলিম বিয়ে বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯, মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন ১৯৭৪, মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) বিধিমালা ১৯৭৫, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ ১৯৮৩, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫, নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৩ ইত্যাদি। এছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ আইন, এসিড অপরাধ দমন আইন, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন এবং নারীর অনুকূলে আইন-বিধি ও নীতিমালার মধ্যে সিডও সনদের ভিত্তিতে ১৯৯৭ সালে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতি নারীর মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

৪. ইসলামে নারীর মর্যাদা

ইসলাম ধর্মে নারীকে তার যথাযোগ্য মর্যাদাসহ মানুষ হিসেবে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ইসলামে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, নারীরা মানুষ, তাদের কোন অপমান গ্রাহ্য করা হবে না, এটা নিন্দার্হ, কেননা তারা পুরুষের পরিপূরক এবং দেশ ও সমাজের উন্নয়নের অংশীদার। নারীর মর্যাদা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে বেশি। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত, কন্যা সন্তান ভাগ্যবানদের জন্য এবং কোনো পুরুষের ভালো হওয়াও তার স্ত্রীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল। দাম্পত্য জীবনে স্বামী তার স্ত্রীর সহযোগী ও পরিপূরক হিসেবে দায়িত্ব পালনে চুক্তিবদ্ধ।

৫. নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতনের কিছু তথ্য

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এ পর্যন্ত নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চাকরি, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে আজ বাংলাদেশের নারীরা রাজনীতি, সেনা, নৌ, বিমান, আনসার, পুলিশ, প্রশাসক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, শিক্ষক, গবেষক ইত্যাদি পেশায় সম্পৃক্ত রয়েছেন এবং তারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। তারপরও এখন পর্যন্ত যেভাবে সব পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ার কথা, সেভাবে তা ঘটেনি। কারণ, নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন না হওয়ায় সমাজ কাঙ্ক্ষিত লক্ষে পৌঁছাতে পারেনি। আর সেজন্যই নারীকে দমন, পীড়ন ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। নতুন নতুন কৌশলে নারী নির্যাতনের চেষ্টা চলছে। নারীর প্রতি জবরদস্তি, হয়রানি, মানসিক নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিবার ছাড়াও রাস্তাঘাটে, বাজার-শপিং মলে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, কর্মক্ষেত্রে, যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন মাধ্যমে (ইন্টারনেটে, মোবাইলে) সংঘটিত হওয়ার ঘটনা প্রায়শই ঘটে। নারী ও মেয়ে শিশুরা যৌন হয়রানি, শারীরিক লাঞ্ছনা ও ধর্ষণের শিকার হন। সমাজে দৃশ্যমান কিছু সংকট যেমন বখাটেদের উৎপাত, ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণ, গণধর্ষণ ও খুন পর্যন্ত সংঘটিত হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে নারীর সামাজিক সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান জরুরি।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোহাগী জাহান তনু ২০ মার্চ ২০১৬ রাতে নৃশংষভাবে খুন হন। তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষার্থী। কুমিল্লা সেনানিবাসের পাওয়ার হাউস এলাকা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। তনু হত্যার প্রতিবাদে এ ঘটনার সাথে জড়িত অপরাধীদের সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে সারা দেশের মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠেন। দেশের ১৪টি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সংগৃহীত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত আট বছরে ধর্ষণের শিকার ৪৩০৪ জনের মধ্যে ৭৪০ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। বছরভিত্তিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৮ সালে ধর্ষণের শিকার ৩০৭ জনের মধ্যে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় ১১৪ জনকে। ২০০৯ সালে ধর্ষণের শিকার ৩৯৩ জনের মধ্যে ১৩০ জন, ২০১০ সালে ধর্ষণের শিকার ৫৯৩ জনের মধ্যে ৬৬ জন, ২০১১ সালে ধর্ষণের শিকার ৬৩৫ জনের মধ্যে ৯৬ জন, ২০১২ সালে ধর্ষণের শিকার ৫০৮ জনের মধ্যে ১০৬ জন, ২০১৩ সালে ধর্ষণের শিকার ৫১৬ জনের মধ্যে ৬৪ জন, ২০১৪ সালে ধর্ষণের শিকার ৫৪৪ জনের মধ্যে ৭৮ জন এবং ২০১৫ সালে ধর্ষণের শিকার ৮০৮ জনের মধ্যে ৮৫ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় (প্রথম আলো, মঙ্গলবার ২৯ মার্চ ২০১৬)। একই উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিএনডব্লিউএলএ জানাচ্ছে, ২০১০ সাল থেকে গত বছর পর্যন্ত ধর্ষণের চেষ্টা, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, ধর্ষণের পর আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে ৪৪২৭টি। এর মধ্যে মামলা দায়ের করা হয়েছে ২৭৩৪টি। গত ছয় বছরে ধর্ষণের পর পাঁচ শতাধিক নারীকে হত্যা করা হয়েছে। তবে হত্যা করার পর সব পরিবার মামলা বা আইনি আশ্রয় নেয়নি। এর মধ্যে মামলা হয়েছে মাত্র ২৮০টি ঘটনার। আর ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছেন ১৬৮ নারী এবং মামলা হয়েছে মাত্র ১১৩টি।

বাংলাদেশের ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, (জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যমতে) ২০০১ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ধর্ষণের শিকার হন ১৮১ জন গৃহকর্মী। তাদের মধ্যে ধর্ষণের পর মোট কতজনকে হত্যা করা হয়েছে, সেই পরিসংখ্যান জানা না গেলেও সংগঠনটির দেয়া তথ্য অনুযায়ী, শুধু ২০১৫ সালে ধর্ষণের শিকার ১১ জনের মধ্যে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় ৪ জন গৃহকর্মীকে।

দেশে ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে নারী নির্যাতনের ঘটনা ৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের ৫৫টি জেলায় নিজস্ব কর্মীদের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ব্র্যাকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নারীর প্রতি সহিংস ঘটনার ৬৮ শতাংশই নথিভুক্ত হয় না। নারী নির্যাতন নিয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) করা "ভায়োলেন্স অ্যাগেইনস্ট উইমেন (ভিএডব্লিউ) সার্ভে" ২০১১ প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, স্বামীর মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার হন দেশের বিবাহিত নারীদের ৮৭ শতাংশ। বাংলাদেশ পুলিশের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০১০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতনের মোট মামলা ছিলো ১৭৭৫২টি। ২০১৫ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২১২২০টি (প্রথম আলো, বুধবার ৩০ মার্চ ২০১৬)। স্থানীয়ভাবে নারী নির্যাতনের চিত্র পাওয়া যায় দিনাজপুরের ৮টি উপজেলার আদালতে দায়েরকৃত মামলার তথ্য বিবরণীতে (সারণি-১)।

সারণি-১

জানুয়ারি ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত দিনাজপুর জেলায় নারী নির্যাতনের তথ্য

ক্রমিক	প্রকৃতি	সংখ্যা
০১	যৌতুকের জন্য নির্যাতন	৬৮
০২	জোর পূর্বক অপহরণ	২০
০৩	অপহরণ, মুক্তিপণ ও ছবিতোলা	০৭
০৪	প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণ	০২
০৫	যৌন নিপীড়ন	১২
০৬	আটক ও মুক্তিপণ	০১
০৭	জোরপূর্বক ধর্ষণ	৩৮
০৮	অপহরণ ও ধর্ষণ	০৩
০৯	ধর্ষণ চেষ্টা	২০
১০	অপহরণ ও সহায়তা	১৫
১১	নারী পাচার	০১
১২	যৌন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা	০৫
১৩	যৌতুকের জন্য নির্যাতনে মৃত্যু	০২
১৪	শিশু পাচার	০১
১৫	শরীরে গরম দুধ ঢেলে দেয়া	০১
১৬	এসিড নিক্ষেপ	০১
১৭	বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে অপহরণ	০৬
১৮	জোর পূর্বক ধর্ষণের পর খুন	০১
১৯	মারপিট করে হত্যা	০১
২০	পর্ণোগ্রাফিসহ ধর্ষণ	০১
	সর্বমোট	২০৬

উৎস: পল্লী শ্রী, দিনাজপুর কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য।

নারী নির্যাতনের এই ঘটনাগুলো আদালত কর্তৃক লিপিবদ্ধ। লিপিবদ্ধ নয় এমন নির্যাতনের চিত্র জনসাধারণের অগোচরে রয়ে গেছে। এগুলোর মধ্যে যৌতুকের জন্য শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে সবচেয়ে বেশি। তারপর রয়েছে জোরপূর্বক ধর্ষণ এবং অপহরণের ঘটনা। পত্রিকায় এ ধরনের খবর প্রায়ই প্রকাশিত হয়। বখাটে কর্তৃক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের পর ফেসবুকে ভিডিও প্রকাশ করা, ছাত্রীকে বিদ্যালয়ে

আসা-যাওয়ার পথে উত্ত্যক্ত করা, হোটেলে নিয়ে তরুণীর শ্লীলতাহানি করে মোবাইল ফোনে ভিডিওচিত্র ধারণ করে সেগুলো ফেসবুকে দেয়া, স্বামীর হাত পা বেঁধে স্ত্রীকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত মিলে ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা করে খালের ঝোপের ভিতরে ফেলে রাখা ইত্যাদি খবরের সাথে অনেকেই কম-বেশি পরিচিত।

গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে রাঙ্গামাটিতে, পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীর প্রতি সহিংস ঘটনার উপর একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী গত ১০ মাসে রাঙ্গামাটিতেই ৩৩টি আদিবাসী নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এরমধ্যে ১টি ধর্ষণের পর হত্যা, ৯টি ধর্ষণ, ৭টি গণধর্ষণ, ২টি শারীরিক লাঞ্ছনা, ১২টি ধর্ষণ চেষ্টা ও ২টি যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেছে। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা বিদ্যমান থাকলেও নারীর যৌন, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে ঐ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা দাবি করেন।

৬. নারী-পুরুষ সম্পর্ক ও ন্যায্যতার সংকট

দেশ-কালভেদে নারী-পুরুষের প্রেম, ভালোবাসা, যৌন সম্পর্ক, বা যৌনাচার বিষয়ে সমাজ যা অনুমোদন করে তা মান্য করাই সদাচার। সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্ম, প্রচলিত আইন এ ধরনের সামাজিক অনুমোদনের ভিত্তি। কোনো দেশের নাগরিকের জন্য প্রচলিত আইন, ধর্ম ও সামাজিক অনুশাসন প্রতিপালন করা অপরিহার্য এবং অনেক ক্ষেত্রে তা বাধ্যতামূলক। সমাজে এ ধরনের অনুশাসনের কার্যকারিতাকে ন্যায্যতার মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা যায়। তাই সমাজে পুরুষ কর্তৃক নারীকে যৌন হয়রানি, শারীরিক লাঞ্ছনা, ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণ, ধর্ষণকে নীতি ও ন্যায্যতার সংকটরূপে বিবেচনা করা যায়। আইন না মানার প্রবণতা এবং বিচারহীনতা ন্যায্যতার সংকটের ফলস্বরূপ।

৬.১ নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মর্যাদার প্রতি অবজ্ঞা

পৃথিবীর অনেক দেশে নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতা, অবহেলা, দমন-পীড়ন, অপহরণসহ যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, নির্যাতনের পর হত্যা ইত্যাদি ঘটনার ভয়াবহতা লক্ষ্য করা যায়। নারীত্ব ও সৌন্দর্য নারীর নিজস্ব সম্পদ। নারীর ব্যক্তিত্ব থেকে তাকে আলাদা করা সম্ভব নয়। কিন্তু, এই সৌন্দর্য তার মহাবিপদের কারণ হয়ে উঠবে কোনো সচেতন মানুষের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অথচ, নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করতে অনেকে আত্মবিস্মৃত পর্যন্ত হন। অন্যায়ভাবে নারীত্বকে অসম্মান করতে, নিজের অধিকারে অথবা নিয়ন্ত্রণে আনতে, নারীকে সম্পদে কিংবা ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করতে গিয়ে দুর্বৃত্তরা নারীর ব্যক্তিসত্তা, অধিকার, স্বাধীনতা ও পছন্দের কথা বিস্মৃত হন এবং তাদের গর্হিত কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে গুরুতর অপরাধে জড়িয়ে পড়েন, শেষ পর্যন্ত আইন ভঙ্গ করে নারীর প্রতি অবিচার ও নির্যাতন, অপহরণ, জোরপূর্বক ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, এমনকি খুন পর্যন্ত করে ফেলেন। এরপর যখন অপরাধীর বিচার কিংবা দণ্ড নিয়ে সংশয় দেখা দেয়, তখন ভুক্তভোগীর অসহায়ত্ব ও হতাশার কোন শেষ থাকে না।

৬.২ নারীর প্রতি পারিবারিক নির্যাতন ও সহিংসতা

নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতা ও নির্যাতন এদেশে নতুন বিষয় নয়। এই সহিংসতা ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহর-গ্রামে, শ্রেণি-বর্ণ নির্বিশেষে সব ক্ষেত্রে বিদ্যমান। পরিবারের অভ্যন্তরে নারীর উপর শারীরিক, মানসিক, যৌন কিংবা অর্থনৈতিক নির্যাতনের ঘটনা বহুকাল ধরে ঘটছে। বর্তমানেও এ

ধরনের ঘৃণ্য ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রুমানা মঞ্জুরের কথা মনে করা যায়। মেধাবী ও অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী এই নারী দীর্ঘদিন ধরে বেকার স্বামীর নির্যাতন সহ্য করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে দৃষ্টিশক্তি হারাতে হয়েছিল। এভাবে কত নারী দিনের পর দিন স্বামী কর্তৃক শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হয়েছেন বা হচ্ছেন, তার কয়টির আইনি সমাধান হয়েছে বা হবে অথবা এভাবে কোন ভয়ংকর পরিণতির মধ্যে দিয়ে কত জীবনের অবসান হয়েছে বা হবে, তার সব খবর জানা যাবে না। নারীর প্রতি ঘটমান নৃসংশতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা, জনসমক্ষে গাছে বেধে নির্যাতন, যৌতুকের জন্য পিটিয়ে হত্যা, চলন্ত বাসে নারী যাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনা সভ্যতার অগ্রগতিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

৬.৩ নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী

নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী এখনো প্রত্যাশিতভাবে বদলায়নি। একজন নারী যদি কোনো পুরুষকে বাধতে না পারেন তাহলে তিনি যথেষ্ট নারীই নন এমন বিদ্রুপ নারীর প্রতি তার অজান্তেই আরোপিত হয়। বিয়ের জন্য পাত্রী পছন্দের বেলায় অধিকাংশক্ষেত্রে বরপক্ষ মেয়েটির বাহ্যিক সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দেয়, আর অল্প ক্ষেত্রে গুরুত্ব পায় তার গুণ। তালাকপ্রাপ্ত নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এখনো নেতিবাচক। কারণ যাই হোক, তালাকপ্রাপ্ত নারীকে আড়ালে কেউ কেউ স্বামীর ঘর করতে পারেনি বলে উপহাস করতে ছাড়েন না। একইভাবে বিধবা নারীদেরকে সমাজ শুভ দৃষ্টিতে দেখে না। নির্যাতনের মুখে স্বামীর ঘর ছেড়ে আসা নারীরও ভাগ্যে কটাক্ষ ছাড়া ভালো কিছু জুটে না। স্বামীর ঘর করতে পারেনি বলে তাকে নানা অপবাদ শুনতে হয়। বিয়ের পর কোন মেয়ের স্বামী মারা গেলে মেয়েকে অলক্ষণা বলে দোষ দেয়া হয়। এসব ঘটনা যে শুধু নিরক্ষর, হতদরিদ্র মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে তা নয়। সমাজের অগ্রসর ও সচেতন মানুষের দলে যাদের নাম তাদের কারো কারো মধ্যেও রয়েছে নারীর প্রতি এ ধরনের অনেক অযৌক্তিক, বিরূপ ধারণা এবং নেতিবাচক মনোভাব। নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর এই প্রেক্ষাপটে ইতিবাচক পরিবর্তনের চিন্তা-ভাবনা নারীর প্রতি সুবিচারের ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘকালীন, সুসংহত এবং কার্যকর পদক্ষেপের প্রয়োজন প্রয়োজন। নারীর প্রতি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কিন্তু, তা নিশ্চিত করা সমাজের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

সমাজ নারীর প্রতি নানা প্রকার অবিচার করে। দেশের যৌনপল্লীগুলোতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক যৌনকর্মীর সংখ্যা বেশি। মেয়েদের বিয়ের বয়স আঠারো। কিন্তু, এর চেয়ে কমবয়সী মেয়েরও বিয়ে হচ্ছে। মেয়ে শিশু পাচারসহ তাদের দিয়ে অন্যায্য অনেক কাজই করানো হয়। সামাজিক কাজকর্মে নারীর পারিশ্রমিক পুরুষের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম। গৃহকর্মে নিযুক্ত নারীর কাজের পারিশ্রমিক হিসাব করার রীতি নেই। বিয়ের পর স্ত্রীর মোহরানা স্বামী কর্তৃক পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক হলেও অনেকে তা করেন না। এই ব্যাপারে স্বামীর পরিবার তা আদায় করে দিতে সহযোগিতা করতে পারে এবং সেটাই স্বাভাবিক হওয়া উচিত। কিন্তু, স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ না করার জন্য অনেকেই চতুরতার আশ্রয় নেন। যৌতুক আদায়ের ক্ষেত্রে পাত্রপক্ষ বিশেষ করে, পাত্রের পরিবারের সদস্যরা অতি উৎসাহী ও তৎপর হলেও নববধূর মোহরানা পরিশোধের ক্ষেত্রে তারা অবিশ্বাস্যভাবে উদাসীন থেকে যান।

৬.৪ সংস্কৃতি ও চিত্রজগতে নারীর অবমূল্যায়ন

আধুনিক সংস্কৃতির বিস্ময়কর উৎকর্ষের যুগেও নারীর অধিকার হরণে অনেকে তৎপর। সাধারণভাবে একই ধরনের কাজে নারীর মজুরি পুরুষের চেয়ে কম বা সমান। কিন্তু, ম্যাক্সিকান অভিনেত্রী সালমা হায়েক এর

কথায় "একমাত্র পর্ণ ছবিতেই নারীকে পুরুষের চেয়ে বেশি পারিশ্রমিক দেয়ার চল রয়েছে।" চিত্র জগতে নারীর উপর নিপীড়ন নিয়ে বিশেষ প্রতিবাদ হয় না বলে তিনি মনে করেন। রূপালি পর্দায় নারীর অভিনয় দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার চেয়ে শরীর এবং শরীরী ভাষা উপস্থাপনকে একটি বাণিজ্যিক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যাতে দর্শকেরা বিমোহিত হতে পারে। এক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়ে অনেকাংশে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হন।

বাঙালি সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান পহেলা বৈশাখে বর্ষবরণ। বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের মুহূর্তে প্রায় সবাই পরস্পরের শুভকামনা করেন। অথচ, এমন দিনেও ঘটে ঘটেছে টিএসসিতে নারী নির্যাতনের ঘটনা- যেখানে একজন নারীকে অগণিত মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কতিপয় দুর্বৃত্তের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। সংস্কৃতি মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়ক এবং এটি মানব সত্তার সুকুমার বৃত্তিকে শাণিত করে। কিন্তু, কেবল আনুষ্ঠানিকতাই মানুষের প্রকৃত সংস্কৃতিবান হওয়ার প্রমাণ নয়। একটি দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান, মনোভাবের পরিবর্তন ও অনুশীলনের দ্বারা মানুষকে মনে-প্রাণে সংস্কৃতিবান হতে হয়। ফলে, সংস্কৃতিবান মানুষ এ ধরনের গর্হিত কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে দূরে রাখতে সক্ষম হন এবং সমাজের অন্য নাগরিকের চিন্তা চেতনার উপরও তার ধনাত্মক প্রভাব পড়ে।

৬.৫ কর্মক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা

একজন পুরুষ ঘরের বাইরে বেশ নিশ্চিন্তেই চলাফেরা করতে পারেন, কিন্তু, একজন নারী তা পারেন না। নিরাপদে পথ চলতে নারীকে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত করা একটি অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয়। পথে-ঘাটে কোথায় কোন উপদ্রপ নারীর জন্য ওঁৎ পেতে থাকে তা কেউ জানে না। এজন্য প্রয়োজন হয় বাড়তি যত্ন এবং সতর্কতার। প্রতিকূল পরিবেশের কারণে কর্মক্ষেত্রেও নারী তার নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে পারেন। নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা এক্ষেত্রে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নারীরা যাতে কর্মক্ষেত্রে পুরুষ সহকর্মী কতৃর্ক অন্যায়ভাবে নিয়ন্ত্রিত, নিগৃহীত, অপদস্থ না হন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯ এর "২৭এ" অনুযায়ী কোনো সরকারি কর্মচারী নারী সহকর্মীর প্রতি কোনোভাবে এমন কোনো ভাষা ব্যবহার বা আচরণ করতে পারবেন না, যা অনুচিত এবং অফিসিয়াল শিষ্টাচার ও নারী সহকর্মীদের মর্যাদা হানি হয়।

৬.৬ নারীর অর্থনৈতিক বঞ্চনা

অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত নারী নিজের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মৃদু প্রতিবাদের সাথে অথবা বিনা বিবাদে সংসারে মানিয়ে চলার চেষ্টা করেন। দীর্ঘ বঞ্চনা তাকে অল্পে তুষ্ট থাকতে প্রেরণা যোগায়। এক্ষেত্রে ন্যায্যতার প্রশ্নটি প্রাধান্য পায় না। লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রকৃত রূপ যুগ যুগ ধরে অনুদঘাটিত থেকে যায়। দুঃখ করে কেনো কোনো নারীকে বলতে শোনা যায়, তার/তাদের নিজের কোনো বাড়ি নেই। তার বাপের বাড়ি, ভাইয়ের বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি, স্বামীর বাড়ি, ছেলের বাড়ি আছে। যিনি সারা জীবন গৃহসেবা করেন তার নিজেরই গৃহের অভাব! গৃহিণীই গৃহের মালিক সেই স্বীকৃতি আজও সমাজে নেই। অধিকাংশ নারীর জীবনে এরকম উপলব্ধির বাস্তবতা রয়েছে। আমাদের সমাজে খুব কম সংখ্যক নারীর নিজের নামে বাড়ি আছে। ব্যক্তি মালিকানার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে পারিবারিক অর্থ-সম্পদে নারীর মালিকানা স্বল্প। ব্যাংক, বীমায় নারীর অভিগম্যতা কম। সঞ্চয়-বিনিয়োগে স্বাধীনতা অপর্যাপ্ত। এসব কারণে নারীর অসহায়ত্ব বেশি। নারীর কাজের স্বীকৃতি ও মর্যাদা নিশ্চিত করা গেলে

নারীর এই অসহায়ত্ব কমত। আইন অনুযায়ী একজন নারীর পিতা এবং স্বামীর সম্পদে নির্দিষ্ট অংশ প্রাপ্য। কিন্তু, অনেক ক্ষেত্রে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তির ন্যায্য অংশ থেকে নারীকে বঞ্চিত করা হয়। পারিবারিক বিষয়-সম্পদে নারীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করা অত্যন্ত আবশ্যক। বাস্তবে অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকে নারীর মুক্তি যতদিন অর্জিত না হবে, নারীর প্রতি সুবিচার নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা ততোদিন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

৭. নারী নিগ্রহ কমলে কল্যাণ বাড়বে

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনায় প্রচুর মামলা হয়। ঐ মামলা পরিচালনায় বাদি ও আসামী/বিবাদিদের যে সময় ব্যয় হয় তার আর্থিক মূল্য কম নয়। ঐসব মামলা পরিচালনায় সরকারের উল্লেখযোগ্য সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়। মামলায় যারা জড়িত হন তাদেরও আদালতে উপস্থিতির জন্য প্রচুর সময়, শ্রম ও অর্থ নষ্ট হয়। আর্থিক ক্ষতি ছাড়াও সংশ্লিষ্টদের মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এসব খরচ, সময় ও ভিজিট কমানো গেলে জাতীয় অর্থনৈতিক সুবিধা ও কল্যাণ বাড়বে।

৮. প্রতিকারের উপায়

একটি যৌতুকমুক্ত সমাজ, বাল্যবিবাহ মুক্ত দেশ এবং নারী নির্যাতন মুক্ত বিশ্ব এখন সময়ের দাবি। নারীর বঞ্চনা- বৈষম্যের দায় কখনো পুরুষ, কখনো ধর্ম, কখনো শ্রেণি, কখনো সরকার, কখনো আইন-শৃঙ্খলার অভাব, কখনো প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ইত্যাদির উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু, বিচ্ছিন্নভাবে বিশেষ কারো উপর নারী বঞ্চনার অভিযোগের দায় চাপিয়ে নারীর প্রতি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ অগ্রগতি অর্জন সম্ভব নয়। নারীর সুরক্ষার বিষয়টি পুরুষের (এবং সমাজের) চেতনায়, ধারণায়, জ্ঞানে, বিশ্বাসে, কর্মে ও জীবনচর্চায় স্থায়ী ও সুদৃঢ় করা সম্ভব হলে আশানুরূপ ফল লাভ করা যাবে এবং নারীর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। যৌন হয়রানি, ধর্ষণ প্রতিরোধে বখাটেদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী অভিযান পরিচালনা করতে হবে এবং অপরাধীকে আইনের আওতায় এনে সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবার, বিশেষ করে পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

নারীর অধিকার, মর্যাদা ও সুবিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সংবিধান প্রদত্ত আইনি সুরক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান, দেশে প্রচলিত আইনের আশ্রয় লাভের সুযোগ, সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগতি, বিভিন্ন নীতিমালা সম্পর্কিত ধারণা ইত্যাদি নারীর নাগরিক হিসাবে আইনি সহায়তা গ্রহণের সাহস, প্রেরণা ও আগ্রহ সৃষ্টি করে। কিন্তু, অনেকে টাকা-পয়সার অভাবে, ক্ষমতাধর বা প্রভাবশালী ব্যক্তির সমর্থন না থাকায় নির্যাতিত হলেও থানায় গিয়ে অভিযোগ করে আইনি সহায়তা গ্রহণে সক্ষম হন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মামলা গ্রহণে কালক্ষেপণ ও অহেতুক হয়রানির ঘটনাও ঘটে। মামলা হলেও প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে মামলা দুর্বল হয়। বাদী-বিবাদীর মধ্যে মামলা চলাকালীন সময়ে আপোষ মিমাংসা হয়ে যাওয়াও একটি সাধারণ ঘটনা। অনেক ক্ষেত্রে বিচার প্রার্থীর আর্থিক সামর্থ্য ও লোকবলের অভাবে মামলা পরিচালনা করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা বা বিচার পেতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার ঘটনাও বিচার প্রার্থীকে নিরুৎসাহিত করে। আবার কখনো অপরাধী কোন প্রভাবশালীর আশ্রয়-প্রশ্রয়ের কারণে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যান। এসব কারণে অপরাধীরা বিচারের আওতার বাইরে থেকে পুনর্বার অপরাধে লিপ্ত হয়। ফলে নারীর ন্যায় বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত হয় না। অপরাধী যেই হোক, তাকে বিচারের আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা প্রবর্তন ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে পাঠ্যক্রম পুনর্গঠন করা যেতে পারে। নারীর প্রতি পুরুষের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আবশ্যক। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পরস্পরকে সম্মান করার ও মর্যাদা দানের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষ উভয়ের পোশাক ফ্যাশনে পরিমিতি বোধ, রুচিশীলতা ও শালীনতার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বন্ধু নির্বাচনে যথেষ্ট সচেতনতা অবলম্বন করা জরুরি। ছেলে-মেয়েদের বাড়ির বাইরে চলাফেরার সময় তাদের অবস্থান ও সঙ্গীসাথীদের সম্পর্কে বাবা-মায়ের অবশ্যই ভালো ধারণা রাখতে হবে। পিতা বা স্বামী হিসেবে নিজ মেয়ে বা স্ত্রীর যথাযোগ্য মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সব কাজে আইনের প্রতি অনুগত থাকার চর্চা করতে হবে। নারী শিক্ষার অগ্রগতি নারীর মর্যাদা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।

৯. উপসংহার

বিচারহীনতা অপরাধের পুনরাবৃত্তিকে উৎসাহিত করে। একটি সুখী পরিবার, সভ্য সমাজ, উন্নত দেশ গড়তে হলে নারীর ন্যায় বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা জরুরি। প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ, ধর্মীয় জ্ঞান, শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি, মানসিকতার পরিবর্তন, মর্যাদা বোধের উন্নয়নের মাধ্যমে তা করা যায়। সামাজিক দায়িত্বশীলতা, মনস্তাত্ত্বিক শৃঙ্খলা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আপরাধীর শাস্তি বা দণ্ড কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হলে নারীর প্রতি ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। অনেক সময় নারী তার পরিবারের সদস্য দ্বারা নির্যাতনের অথবা সহিংসতার স্বীকার হন। তাই সে সব পরিবারকে আগে নির্যাতনমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। পরিবারের মধ্যে নারীর প্রতি যথাযথ সম্মান, শ্রদ্ধা ও সুবিচার করার চর্চা বিদ্যমান থাকলে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করা যাবে। নারীর মর্যাদা দানের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা নিজ নিজ পরিবার থেকে অর্জন করতে হবে।

তথ্যসূত্র

অমর্ত্য সেন, নীতি ও ন্যায্যতা, (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ২০১৩)। (বাংলা সংস্করণ সম্পাদনা, অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় ও কুমার রাণা)।

গোলাম মুরশিদ, হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৬)।

মোঃ মোস্তফা কামাল (সম্পাদক), মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (ঢাকা: পানকৌড়ি প্রকাশন, ১৯৯৪)।

মুহম্মদ সাইফুল আলম, নারী ও শিশু নির্যাতন এবং যৌতুক নিরোধ আইন (ঢাকা: ১৯৯৫)।

বাংলাদেশ সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস (ঢাকা: ১৯৯৬)।

————, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০।

————, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৩।

মোঃ আব্দুস সালেক, প্রচলিত আইনে নারীর অধিকার (বগুড়া: ২০০০)।

সুলতানা কামাল, নারী, মানবাধিকার ও রাজনীতি (ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ, ২০১০)।

দৈনিক প্রথম আলো, বিভিন্ন সংখ্যা।

দৈনিক সমকাল, বিভিন্ন সংখ্যা।